The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 205 - 218)
Published in November 2024

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নৈতিক শিক্ষা: কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ

রীতা রানী ধর *

প্রতিপাদ্যসার: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের প্রধান এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর হল গীতা পরিপূর্ণভাবে বর্তমান আকারে প্রচারিত হচ্ছে। দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে গীতার অমৃতজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সারাবিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ এই জ্ঞান এবং নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে। এই গীতা সর্বশাস্ত্রের শিরোভূষন এবং সমানভাবে সর্বসম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণীয়। গীতা শুধু পাঠ করার জন্য পড়লে হয় না। এই শাস্ত্রের অর্থ এবং নীতি-আদর্শগত শিক্ষা অনুধাবন করে তা আমাদেরকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই গীতা পাঠ করা সার্থক। আলোচ্য প্রবন্ধে গীতার নৈতিক শিক্ষার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎপত্তি ও ইতিকথা : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বহু প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী আপামর জনসাধারণের কাছে একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে দ্বাপর যুগে শ্রীগীতার এ অমৃত বাণী কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ব্যক্ত করেছিলেন। অবশ্য শ্রীগীতার উৎপত্তি আরও অনেক প্রাচীন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের সূচনায় এর উৎপত্তি ও ইতিকথা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ দেখা যায়। শ্লোকটির শব্দার্থ অনুবাদ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে এ ধর্মগ্রন্থটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উৎপত্তির শ্লোক ও অনুবাদ :

শ্রীভগবান উবাচ
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীহ। ৪/১

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানব জাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন (বসাক ১৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎপত্তির ইতিহাস অতি পুরাতন। পরমেশ্বর ভগবান নিজেই শ্রীগীতার ইতিহাস বর্ণনা করছেন। সূর্যকে একটি শক্তিরূপে কল্পনা করে প্রচীন কাল থেকে তাঁকে দেবতা হিসেবে মনে করা হত। তিনি সকল গ্রহের রাজা। অশেষ তেজবিশিষ্ট এবং জগতের চক্ষুস্বরূপ। মানুষ যেমন চক্ষু ব্যতীত কোন কিছু দেখতে পায় না তেমনি সূর্য ছাড়া সারা পৃথিবী অন্ধকার। তিনি অন্যান্য গ্রহকে তাপ ও আলো দান করেন। ভগবান অতি কৃপা করে প্রথম শিষ্যরূপে সূর্যদেব (বিবস্বান) কে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমুদয় জ্ঞান দান করেছিলেন এবং পরবর্তীতে বিবস্বানের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহের রাজাদেরকেও তা দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে যখন ত্রেতা যুগের শুরুতে ভগবৎ জ্ঞান বিবস্বান (সূর্যদেব) মানব জাতির জনক মনুকে দান করেন। মনু পরবর্তীকালে এই তত্ত্বজ্ঞান তাঁর পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর এবং রঘু বংশের জনক ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, রঘু বংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। অতএব এই শ্রীগীতার তত্ত্ববাণীর জ্ঞান গুরু থেকে শিষ্যতে পরম্পরাক্রমে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত ও প্রবাহিত হয়ে আসছে। কিন্তু এক সময় এই পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যায় এবং এই জ্ঞান আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই ভগবান নিজে এসে আবার এই জ্ঞান দান করলেন।

ভগবান যখন সূর্যদেব বিবস্বানকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শোনান তখন অর্জুনও অন্য কোন রূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সাথে অর্জুনের পার্থক্য হচ্ছে যে, অর্জুন তা ভূলে গেছেন। কিন্তু ভগবান তা ভোলেননি। তাই ভগবান শ্রীগীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বলেছেন

শ্রীভগবান উবাচ
বহূনি মে ব্যাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ]] ৪/৫

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান বললেন- হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি কিন্তু তুমি পারো না ৯(বসাক ১৪)।

তাৎপর্য ঃ উপর্যুক্ত শ্লোকের অনুবাদ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, মানুষ কখনো পূর্ব জন্মের ঘটনা প্রবাহ জানতে পারে না। তাই দ্বাপর যুগে অর্জুন কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষীয় কুরুবংশের আত্মীয় স্বজনদের বধ করে রাজ্য লাভ করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্বে প্রচারিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী পুনরায় শোনানোর কারণে অর্জুনের জ্ঞান ফিরে আসে এবং যুদ্ধ করতে মনস্থির করলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উৎপত্তির সময় :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উৎপত্তির ইতিকথা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সকল ঘটনা প্রবাহ অতি প্রাচীন যুগের। অন্য কোন উৎস থেকে এ ঘটনা প্রবাহের সময় জানা না গেলেও বিভিন্ন প্রমাণ, ঘটনা অনুষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান ও পৌরণিক গ্রন্থ থেকে এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ উৎপত্তির সময় নির্ধারণ করতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার রূপে দ্বাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যুগ চারটি যথা: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রতিটি যুগে মানুষের পৃথক পৃথক কার্যাবলী, ধর্মাভাব ও আচরণবিধি পরিলক্ষিত হয়েছিল, যাকে বলা হয় যুগধর্ম। নিম্নে চারটি যুগধর্মের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। (বসাক ১৫)

(ক) সত্যযুগ : এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বছর। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি এ যুগের মৎস্য (মাছ), কূর্ম (কচ্ছপ), বরাহ (শূকর), ও নৃসিংহ (অর্ধেক নর ও অর্ধেক সিংহ) প্রমূখ এ যুগে ভগবান চারটি অবতার রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এ যুগে বলি, বেন, মান্ধাতা, পুরূরবা, ও কার্তবীর্য- এ ছয় জন রাজা ছিলেন।

সত্য যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। সত্যযুগে চতুস্পাদ অর্থাৎ পুরোটাই ধর্ম ছিল। সত্য পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। কেউ শাস্ত্র নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থ বা বিদ্যা লাভের চেষ্টা করতেন না।
২। তপস্যাই ছিল এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
৩। মানুষের আয়ু ছিল ৪০০ বছর। কোন রোগ, দুঃখ ও শোক ছিল না।
৪। মানুষের সকল কামনা পূর্ণ হতো। সকল মানুষ ছিল পূণ্যবান।
৫। মেঘ সময়মত বারি বর্ষণ করত এবং বৃক্ষরাজি ছিল ফলভারে অবনত।
৬। এ যুগের মানুষ দেবতূল্য ছিল।
৭। পরের দ্রব্যকে দেখতো মাটির ঢেলার মত। চোর, মিথ্যাবাদী বা প্রতারক এ যুগে ছিল না।

৮। এ যুগে অকাল মৃত্যু ছিল না। এমনকি ছিল না রোগভয় ও দুর্ভিক্ষ।
৯। এ যুগে পৃথিবী অতি শস্যশালিনী ছিল।
(খ) **ত্রেতা যুগ :** এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর। অবশ্য মতান্তরে ত্রেতাযুগের ব্যাপ্তিকাল ১২ লক্ষ বছর। এ যুগের বামন , পরশুরাম ও রাম-এ তিনজন অবতার ছিলেন। সূর্য বংশীয় বাহুক, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান্, রঘু, অজু, দশরথ ও রামচন্দ্র এ যুগে রাজত্ব করেন।

ত্রেতাযুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। এযুগে ধর্মের এক পাদ অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ কমে যায় । এযুগ থেকে অধর্মের সূচনা হয়। এযুগে পুণ্য ত্রিপাদ ও পাপ একপাদ ।
২। অধর্মদ্বারা মানুষ ধন ও বিদ্যাদি এ যুগে অর্জন করতে থাকে ।
৩। মানুষের আয়ু ১০০ বছর কমে যায় অর্থাৎ মানুষের মোট বয়স দাঁড়ায় ৩০০ বছর ।
৪। এ যুগের প্রধান ধর্ম জ্ঞান।
৫। মহানির্বাণ তন্ত্রের মতে, মানুষ বেদ নির্দেশিত কর্ম দ্বারা ইষ্টসাধনে অসমর্থ হন। ফলে চিন্তা বেড়ে যায়।
৬। এ যুগে মহাদেব বেদর্থময় স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্তন করেন।
৭। বেদ অধ্যয়নে অক্ষম লোকেরা স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা করে মনুষ্যগণকে দুঃখ, শোক ও পাপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন ।
(গ) দ্বাপর যুগ : এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর এবং মতান্তরে তা ৮ লক্ষ বছর । ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন বৃহস্পতিবার দ্বাপর যুগের সুচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এ যুগের অবতার। বলরাম এ যুগের অনন্তাবতার। মতান্তরে বলরামকে বিষ্ণুর অবতার বলেও অনেক ধর্মবেত্তা মনে করে থাকেন । শাল্ব, বিরাট, হংসধ্বজ , কংস, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্ষঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্টির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিস্ককসেন,শিশুপাল,জরাসন্ধ, উগ্রসেন প্রমুখ এ যুগের রাজা ছিলেন।

দ্বাপর যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১। দ্বাপর যুগে অর্ধপুণ্য ও অর্ধপাপ। অর্থাৎ এ যুগে মানুষ অর্ধেক মাত্র ধর্ম পালন করতে শুরু করলেন।
২। মানুষের আয়ু আরও ১০০ বছর কমে মাত্র ২০০ বছর হলো।
৩। যজ্ঞ ছিল এ যুগের প্রধান ধর্ম।
৪। স্মৃতিসম্মত ক্রিয়া হ্রাস পায়।
৫। মনুষ্যগণ নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।
৬। অধর্মের অংশ অর্ধেক হওয়ায় পৃথিবীতে বহু অন্যায় ও পাপাচার দেখা দেয় এবং রাজাগণ অত্যাচারী হয়ে উঠেন।
৭। অত্যাচারী রাজাদের মধ্যে ছিলেন হস্তিনাপুরের দুর্যোধনসহ শত ভ্রাতা, মথুরার রাজা কংস, মগধের রাজা জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল প্রমুখ। এদের অত্যাচারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়।
৮। উপরিক্ত অত্যাচারী রাজাদের হত্যা ও দমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপন করেন।
৯। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধার্মিক অর্জুনের রথের সারথি হয়ে শ্রীগীতার অমৃতবাণী ঘোষণা করেন।

(ঘ) কলিযুগ : কলিযুগের ব্যাপ্তিকাল ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর। বর্তমানে এ যুগের ৫ হাজার বছর চলছে বলে ধারণা করা হয়। ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এ যুগের আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন এবং দুস্কৃতিকারীদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তারপর পুনরায় সত্যযুগের আরম্ভ হবে। দ্বাপর যুগের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হতে অধর্মের সৃষ্টি হয়।

কলিযুগের বৈশিষ্ট্যসমুহ ঃ

১। কলিযুগে চারভাগের তিনভাগ অধর্ম ও এক ভাগ মাত্র ধর্ম পালন করা হবে।
২। দ্বাপর যুগে মানুষের যে আয়ু ২০০ বছর ছিল তা থেকে ১০০ বছর কমে ১০০ বছর হয়।
৩। মহারাজ পরীক্ষিতের সময় থেকে এ যুগ শুরু হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় এবং তা এখনও চলছে।
৪। ভাগবতে বলা আছে ছলনা, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, ভয়, দীনতা, প্রভুত্ব হবে এ যুগের বৈশিষ্ট্য।
৫। বিষ্ণু পুরাণের মতে ধনের অধিকারী হয়ে মানুষ এ যুগে বেশি গর্ব করবে। ধর্মের জন্য কেউ অর্থ খরচ করবে না।
৬। বেদবাক্যে মানুষের আকর্ষণ থাকবে না।
৭। মাতাপিতাকে মানবে না। পুত্র পিতৃহত্যা ও পিতা পুত্রহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না।
৮। এ যুগের প্রধান গুণ হচ্ছে কম পরিশ্রমে মানুষ পুণ্য অর্জন করবে।
৯। দান করাই হবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
১০। এ যুগের পঞ্চদশ শতকে ধর্ম রক্ষার জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এ পৃথিবীতে আর্বিভূত হয়ে অস্পৃশ্যতা দূর করেছিলেন।
১১। চৈতন্য মহাপ্রভুর মতে, হরিনাম সংকীর্তনই হবে কলিযুগের একমাত্র ধর্ম।

উপর্যুক্ত যুগধর্মগুলো বিশ্লেষণ করে প্রভুপাদ মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর চলছে। এ যুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর। কলিযুগের পূর্বযুগটা ছিল দ্বাপর যুগ যার স্থায়িত্ব ছিল ৮ লক্ষ (মতান্তরে ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার) বছর। দ্বাপর যুগের পূর্বযুগটা ছিল ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১২ লক্ষ (মতান্তরে ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার) বছর। এ ভাবে প্রায় ২০ লক্ষ ৫ হাজার (মতান্তরে ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার) আগে মানব জাতির জনক মনু তার পুত্র এ পৃথিবীর অধিশ্বর ইক্ষ্বাকুকে কোন এক সময় ভগবৎগীতার জ্ঞান দান করেছেন (বসাক ২২) ।

মনুর জন্মের সময় যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন বলে মনে করা হয় তাহলে গীতা প্রথম বলা হয়েছিল ১২ কোটি ৪ লক্ষ বছর আগে এবং মানব সমাজে এ জ্ঞান ২০ লক্ষ বছর ধরে বর্তমান রয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার এ জ্ঞান পুনরায় অর্জুনকে দান করেন। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য ও বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে গীতার ইতিহাস। অবশ্য পৌরাণিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কিছু বেশি বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন- মহাভারত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে পঞ্চম অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে।

বেদ সনাতন ধর্মের প্রথম মূল ধর্মগ্রন্থ। এই বেদ প্রাচীনত আর্য ধর্মের আর্যসভ্যতার অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। বেদের ঋক্ বা মন্ত্রগুলো প্রায় সমস্তই ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। এ সকল মন্ত্র দ্বারা প্রাচীন আর্যগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন। কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্মদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, এ মতবাদ সকলের গ্রাহ্য না। আর্য-মনীষীরা এসকল কর্মকাণ্ডে অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। অমৃতের সন্ধানের অনুসন্ধিৎসু আর্য-ঋষিগণ শীঘ্রই বেদার্থচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে স্থির করলেন যে, নামরূপাত্মক দৃশ্য-প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্যবস্তু, জ্ঞানযোগে তাঁকেই জানতে হবে কারণ, বেদ শুধু বিশেষ গ্রন্থ নয়। ইহা একটি সমগ্র সাহিত্য সূচিত করে। এই সাহিত্যকে মোটামুটি চারটি শ্রেনিতে বিভক্ত করা যায়-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক ধর্মের দুইটি স্বরূপ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড আর আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। এই উপনিষদ হচ্ছে বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। এজন্য উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত।

সাংসারিক জীবনের ধন, যশ, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহা এবং উদাসীন এক শ্রেণির লোক জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণে উৎসুক হয়ে সংসার ত্যাগপূর্বক এ বিষয়ে অরণ্যে বসে গভীর ধ্যান-ধারণা করতেন। তাদের চিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলিই উপনিষদে স্থান পেয়েছে। তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁদের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করতেন। এবং নিজেরাও গুরুর নিকট লব্ধ জ্ঞানের ও সাধনার অনুশীলন করে এই চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধন করেন। উপনিষদ হচ্ছে গুরুর নিকট বসে অর্জিত সেই সাধনার জ্ঞান। এরূপে ক্রমে বহু সংখ্যক উপনিষদের সৃষ্টি হয়। উপনিষদে যে তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে যেসকল বিষয় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে যে সমুদয় ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা এই উপনিষদের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" আজ সমগ্র হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত ও সম্মানিত হয় তা উপনিষদ গ্রন্থাবলীর সারমাত্র বলে মনে করা হয়। গীতায় বলা হয়েছে-

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎস ঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ"।। ৪

অর্থাৎ বহু উপনিষদ রূপ গাভীর দুগ্ধ দোহন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সারাংশ দ্বারা "শ্রীমদ্ভবদ্গীতা" রূপ ক্ষীর প্রস্তুত করে হিন্দুর বিশিষ্ট ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করেছেন। আবার গীতায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুউপনিষৎসু ব্রহ্মাবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" একথাটা লেখা আছে, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গীতা সকল উপনিষদের সারবস্তু। গীতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়, এটা মানব-ধর্মগ্রন্থ। গীতায় সার্বভৌম ধর্মোপদেশ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই তা গ্রহণ করতে পারে। এখন অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা-র কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিনটি অধ্যায় পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হবে।

কর্মযোগ ঃ সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম এবং কামনা ও অহঙ্কারভাব বর্জনাদি উপদেশ দিয়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন স্থিতপ্রজ্ঞতাই-এই অবস্থাই-ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। পূর্বে একথাও বলেছেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে তুমি দারুন হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করছ কেন?
সর্বকামনা বর্জনপূর্বক সাম্যবুদ্ধি লাভ করলেই তো জীবের মোক্ষলাভ হয়, কর্মের আবশ্যকতা কি? তার উত্তরে শ্রীভগবান বললেন, যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা সমত্ব বুদ্ধি বা সম্যক জ্ঞানের ফলে, এই জন্যই তোমাকে কর্মোপদেশ দিচ্ছি অথচ সাম্যবুদ্ধির প্রশংসা করছি, ব্যতীত কর্ম নিষ্কাম হয় না। কিন্তু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কি তুমি কর্ম ত্যাগ করতে পার? প্রকৃতির গুণে বাধ্য হয়ে তোমাকে কর্ম করতে হবে। দেহধারী জীব একেবারে কর্ম ত্যাগ করতেই পারে না। যারা বাহ্যত: কর্ম ত্যাগ করে মনে মনে বিষয়-চিন্তা করে তারা মিথ্যাচারী, কিন্তু যারা ইন্দ্রিয়সকল সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্ম করে, কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। জগতের ধারণ-পোষণের জন্যই যজ্ঞাদি কর্মের সৃষ্ঠি হয়েছে। যে কর্ম যার পক্ষে বিহিত তাই তার পক্ষে যজ্ঞস্বরূপ। এইরূপ নিয়ত কর্ম অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করতে পারলে তাই যথার্থ কর্ম হয়, সেটাতে বন্ধন হয় না। আত্মরাম আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষদের নিজের কোন কর্ম নাই। তাঁদের কর্ম কেবল লোক-শিক্ষার্থ ও লোক-সংগ্রহার্থই হয়।

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছেন। আমিও লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ং কর্মে ব্যাপৃত আছি, তুমিও তাই কর। নিষ্কাম কর্মের তিনটি লক্ষণ মনে রাখিও- (১) সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন এবং (৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। তাই তুমি মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক যুদ্ধ কর।

ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তুমি রাগদ্বেষের বশবর্তী হইও না, তাহলেই ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বিপথে চালিত করতে পারবে না, তারা বশীভূত হবে। এইরূপ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা স্বধর্ম সম্পাদন কর, স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্ম অঙ্গহীন হলেও পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে কামনার বর্শবর্তী হয়ে পাপ আচরণ করে, স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করে, কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। উহা দুষ্পূরণীয় ও দুর্জয়, শ্রেয়োমার্গের শত্রু। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় উহার অধিষ্ঠান-ভূমি, সুতরাং তুমি বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হও, ইন্দ্রিয়কল সংযমপূর্বক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগেই নিশ্চল করিয়া আত্মনিষ্ট হও, পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর; তা হলেই কামনা জয় করতে পারবে, নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে।

পূর্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞান ও কর্মের বিরোধের উল্লেখ করা হয়েছে, এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে সেই বিরোধেরই নিরসন করে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এবং জ্ঞানীদিগেরও নিষ্কামভাবে যথাযথ কর্তব্য-কর্ম করা উচিত, পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়, যারা অজ্ঞান, যারা সংসারসক্তিবশত কর্মে নিযুক্ত আছে, তাদেরকেও কর্ম হতে বিচলিত করা কর্তব্য নয়, এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মপ্রবণতার যুগে এরূপ উপদেশ আমাদের নিকট অনাবশ্যক বোধ হতে পারে। কিন্তু সেকালে সন্ন্যাসবাদের প্রভাব বড় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কর্মদ্বারা বন্ধন হয়, এই মতটি বড় প্রবল হয়েছিল। তাতে লোক সমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই শ্রীভগবান বলেছেন[৭] যে, আমার এই মত অনুসরণ করলেই কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়। এটাই গীতোক্ত যোগ। এই বিষয়ের কিরূপে উদ্ভব হয়েছে এবং প্রচার হয়েছে, তা পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথমে বলা হয়েছে।

কর্ম-মাহাত্ম্য ও কর্ম প্রেরণাই এই অধ্যায়ের প্রধান বর্ণিত বিষয়, সুতরাং এই অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ।

জ্ঞানযোগ: তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা করে শ্রীভগবান বললেন এই অব্যয় যোগ আমি আদি ক্ষত্রিয় রাজা বিবস্বানকে (সূর্যকে) বলেছিলাম। বিবস্বান স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ তোমাকে আমি বললাম। এই প্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্ নিজ অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বললেন,- যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ ধারণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার লীলাতত্ত্বেবর সম্যক অবধারণ করলে মানবের কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম- উপাসক, নিষ্কাম উপাসক-যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। এই প্রকৃতিভেদ-বশতঃই সংসারে কর্মবৈচিত্র্য ও উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়। এই প্রকৃতিভেদে অনুসারেই আমি বর্ণভেদ বা কর্মভেদ করেছি-তাতেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। আমি তার কর্তা হলেও তাতে লিপ্ত হই না বলে আমি অকর্তা। আমার এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা

বুঝতে পারলে মানুষ নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝতে পারে, তার কর্মও নিষ্কাম হয়। পূর্ববর্তী জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্তৃত্বাভিমান বর্ষনপূর্বক নির্লিপ্তভাবে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে গিয়েছেন, তুমিও নিষ্কাম ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন কর। কর্মতত্ত্ব বড় দুরূহ, পণ্ডিতগণ তাতে মোহ প্রাপ্ত হন। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি কর্ম করেও মনে করেন "আমি" কিছুই করি না, তিনিই বুদ্ধিমান, কেননা কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-হেতু তাঁহার কর্মও অকর্মস্বরূপ হয়। আবার অনেকে আলস্য-বুদ্ধিতে বাহ্য-কর্মত্যাগ করে, কিন্তু কামনা ত্যাগ করতে পারে না, তাদের অহংবুদ্ধিও ঘুচে না; এই যে কর্ম ত্যাগ বা অকর্ম ইহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা ইহা বন্ধনের কারণ। যিনি এইরূপ অকর্মে কর্ম দর্শন করে তিনিই বুদ্ধিমান। বস্তুত যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, রাগদ্বেষাদিমুক্ত, যাঁর চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি

ঈশ্বরপ্রীতার্থ বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করিলেও তাঁর কর্মফলের সহিত নিঃশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যা বন্ধনের কারণ হয় না।

এই ত্যাগমূলক কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলে। দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তখন হয়, যখন যজ্ঞাঙ্গগুলিকে ব্রহ্মবোধ করা যায়। যিনি যজ্ঞ করতে বসে স্রুবাদি কিছুই দেখতে পান না, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ভাবনা করতে পারে না, ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত সেই যতিপুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়, এটাই কর্মযোগের শেষ কথা। এই অবস্থায় কর্ম ও জ্ঞান এক হয়ে যায়- 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। এই জ্ঞান লাভ হলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে গুরুপদে প্রণাম আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও গুরুসেবাদি জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধন। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম-এইগুলি জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ সাধন। চিত্তের সংশয়ই সকল অনর্থের মূল, গুরু- বেদান্তবাক্যদিতে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিলে জ্ঞান লাভ হয় জ্ঞান লাভ হয় না, সংশয় ও বিদূরিত হয় না। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয়েছে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় বিদূরিত হয়েছে, সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্ম করিলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না। সুতরাং অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ সংশয়রাশি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদ করে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান কর, স্বধর্ম পালন কর, যুদ্ধ কর। তাতে তোমার পাপ স্পর্শিবে না, জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নাই।

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট তত্ত্ব এই-

১। শ্রীগীতায় যে যোগধর্ম অর্জুনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন যে, এই যোগ আমি পূর্বে সূর্যকে বলেছিলাম। দীর্ঘকালবশে তা লোপ পেয়েছে, সেই পুরাতন যোগ আমি তোমাকে পুনরায় বললাম। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই যোগ শ্রীগীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব, এটা একটি বিশিষ্ট ধর্মমত। তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা ধ্যানযোগ-এ সকল কিন্তু না, অথচ এই সকল মতের সারতত্ত্ব যা তা এর মধ্যে আছে। সেই সূত্র ধরে প্রচলিত কোন মতবাদের সাহায্যে বা পরিপোষণার্থ এর ব্যাখ্যা করলে তা শ্রীগীতার ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ ঘটেছে। ভূমিকায় 'গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ' এবং পরে গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্মী দ্রষ্টব্য।

২। এই অধ্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় অবতার-তত্ত্ব। যুগাবতার কি, অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ম কি, এ সকল বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে।

৩। এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। আমরা হিন্দু- সমাজে যে বর্তমান জাতিভেদ প্রথা দেখি তার কিরূপে উৎপত্তি হল? সেটার মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা কথা আছে। সে সকলের মধ্যে শ্রীগীতার কথাই বিশেষ প্রামাণিক এবং উহা প্রকৃতির গুণগত সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমান বংশগত জাতিভেদ ও শ্রীভগবানের কথিত গুণগত বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে। এর আলোচনা তত্ত্বস্থলে দ্রষ্টব্য।

৪। এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নিষ্কাম কর্ম-তত্ত্ব এবং জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়-যে আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে এ-কথাটি স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যায়-শেষোক্ত ভণিতায় এই অধ্যায়ের নাম সাধারণত: জ্ঞানযোগ বলে উল্লিখিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানীর কর্ম। সেই হেতু নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আটটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তরে লাভ করেন, একথাও বলা হয়েছে। সুতরাং এই অধ্যায়কে 'জ্ঞানযোগ' নাম না দিয়ে 'জ্ঞান- কর্ম-সমুচ্চয়-যোগ' নাম দিলেই সুসঙ্গত হয়। কেউ কেউ 'জ্ঞানকর্ম-সন্ন্যাসযোগ' দিয়েছেন। এখানে কর্ম-সন্ন্যাস অর্থ ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ। এ নামও সুসঙ্গত ।

ভক্তিযোগ ঃ একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বললেন[৬]- যিনি সঙ্গবর্জিত ও মৎপরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। এই কথা শ্রবণ করে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'তোমার' অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নির্গুণ অক্ষরোপাসক-তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভক্তিমার্গে সগুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা- তদুত্তরে শ্রীভগবান বললেন, ভক্তিমার্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যারা আমার সগুণ স্বরূপের উপাসনা, করেন তারাই শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তবে যারা সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ববিষয়ে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সর্বভূতহিতে নিরত থেকে অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা করে, তারাও আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অধিকতর আয়াসসাধ্য, কেননা দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ বিদূরিত না হলে নির্গুণ ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। কিন্তু যারা সর্ব কর্ম আমাতে অর্পণ করে মচ্চিত্ত হয়ে অনন্যভক্তিযোগে আমার ব্যক্ত স্বরূপে উপাসনা করেন, আমি অচিরেই তাদেরকে সংসার হতে উদ্ধার করি, সুতরাং তুমি আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর।

ব্যক্ত উপাসনার বিবিধ পথ-কর্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। মন একান্ত চঞ্চল বলে চিত্ত স্থির করা সহজ নয়। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করতে না পার, তবে অভ্যাস দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করে আমাতে সমাহিত করতে চেষ্টা কর। যদি এই অভ্যাস-যোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীতার্থে আমাতে ভক্তির উৎপাদক যে সকল কর্ম-যেমন সাধুসঙ্গ, ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, আমার লীলাকথাদি শ্রবণ, গুণানুকীর্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি কর্ম করে যাও, তাতেও সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। যদি তাতেও তুমি অশক্ত হও, তবে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে কর্মার্পণরূপ যে যোগ তা আশ্রয় কর, পরে সংযতচিত্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অনাসক্ত চিত্তে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করতে থাক। জ্ঞানবর্জিত অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞানালোচনা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ জ্ঞানালোচনা থেকে ইষ্টবস্তুর ধ্যান-ধারণা শ্রেষ্ঠ, আমার ফলাসক্ত চিত্তে ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা ফলাসক্তি ত্যাগ করে সর্ব কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ত্যাগ থেকেই পরম শান্তি লাভ হয়, সর্ব বিষয়ে সমত্ববুদ্ধি জন্মে।

এরূপ ত্যাগী ভক্তিমান কর্মযোগীর লক্ষণ কি এবং তিনি লোক ব্যবহারে কিরূপ আচরণ করেন তা শুন - আমার ভক্ত কাকেও দ্বেষ করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও ক্ষমাবান, তিনি সমবুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষা, শুভ- অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-দ্বেষ ইত্যাদি দন্দ্ববর্জিত - সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি উদাসীন হয়েও অনলস, গৃহে থাকিয়েও গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিহীন। তুমি এই সকল গুণলাভে যত্নপর হও। যিনি মৎপরায়ণ হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন, তিনিই আমার পরমপ্রিয় ভক্ত। সে হেতু তাকে ভক্তিযোগ বলে।

গীতার নৈতিক শিক্ষা : সার্বভৌম ধর্মোপদেশ

গীতা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়, ইহা মানব-ধর্মগ্রন্থ। গীতায় সার্বভৌম ধর্মোপদেশ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এটা গ্রহণ করতে পারেন। গীতার সেই সার্বজনীন উপদেশগুলি কি এবং সেই উপদেশের অনুবর্তী হয়ে কি ভাবে স্বকীয় ধর্মজীবন ও কর্মজীবন নিয়মিত করলে সকলেই ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করতে পারেন, তাই এক্ষণে বিবেচ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে গীতোক্ত উপদেশের সারমর্ম এই-

১। ধর্মে উদারতা ২। কর্মে নিষ্কামতা ৩। জ্ঞানে ব্রহ্মসদ্ভাব সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, ৪। যোগে বা ধ্যানে ভগবানে চিত্ত-সংযোগ, ৫। ভক্তিতে ভগবৎ শরণাগতি, ৬। নীতিতে আত্মৌপম্যদৃষ্টি-সাম্যবুদ্ধি, ৭। উপাসনা- ভগবৎকর্ম, জীবসেবা, স্বধর্মপালন, ৮। সাধনা- ত্যাগানুশীলন। এ কথাগুলো সমগ্র গীতার সারোদ্ধার।

১। ধর্মে উদারতা : ধর্ম শব্দ "কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত বা সাধন-প্রণালী" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মমত নিয়ে বাদ-বিতর্ক বিরোধ-বিদ্বেষ কেবল আমাদের দেশে নয়, সকল দেশই আছে। আমাদের দেশে তবু এই

বিরোধ কেবল বিদ্বেষ-বহ্নি উদগীরণ করে ক্ষান্ত আছে, অন্যান্য দেশে ধর্মের নামে অমানুষিক নির্যাতন ও ভীষণ হত্যাকাণ্ড-সকল সংঘটিত হয়েছে। এটার কারণ, অনেক ধর্মোপদেষ্টাই বলেন- একমাত্র এই ধর্মই সত্য ও মুক্তিদায়ক, অন্য ধর্ম মিথ্যা। বিধর্মীকে পাশবিক শক্তিবলে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করাও পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হয়ে থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা- "লোকে যে পথই অবলম্বন করুক সকল পথেই আমাতেই পৌঁছাবে যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবে সন্তুষ্ট করি। অদ্বৈত জ্ঞান বা দ্বৈত ভক্তি, যে পথেই যাও সগুণ-নির্গুণ যেটাই চিন্তা কর, আমাকেই পাবে, কেননা মূলতত্ত্বব একমাত্র আমিই। জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম, উপাসনা সকল মার্গেই আত্মস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, অহিন্দু-গীতোক্ত ধর্মে সকলেরই স্থান আছে।

২। কর্মে নিষ্কামতা : কর্মশিক্ষা, কর্ম-প্রেরণা, গীতার একটি বিশেষত্ব। গীতার এবং মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কর্ম-মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, সনাতন ধর্ম-সাহিত্যে অন্যত্র তা অধিক দৃষ্ট হয় না। বস্তুত: প্রাচীন ভারতে কর্মকালই শ্রেষ্ঠ হয়েছিল- শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সুখসমৃদ্ধি, শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু বর্তমান ভারতবাসী, কর্মবিমুখ, অদৃষ্টবাদী, পুরুষকারহীন, বাক্যবাগীশ বলে উপহাসাস্পদ-এরা কেবল 'ঘরেতে বসে গর্ব করে পূর্ব পুরুষের।' পক্ষান্তরে দেখা যায়, যীশুখ্রীষ্ট সর্বত্রই সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় জগৎ এক্ষণে কর্মকেই সারসর্বস্ব করেছেন। খ্রীষ্টীয়ান বাইবেল গুটাইয়া রেখেছেন, আমরা গীতা ভুলিয়াছি। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্ত্যের নিকট কর্ম-মাহাত্ম্য শিক্ষা করছি, কর্ম-জীবনে তাঁরাই আমাদের আদর্শ-স্থানীয় হয়েছেন। কিন্তু সে আদর্শ গীতোক্ত কর্মের আদর্শ নয়, উহা ভারতীয় শিক্ষা-সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-জীবনের মূলে অভিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিশ্বময় আমিত্বের প্রসার; গীতার কর্মসূত্রের মূল নিরভিমানিতা, অহংত্যাগ, জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্ত্য কর্মী রাজস্ব কর্তা-অশান্ত, ফলাকাঙ্ক্ষী, সুখান্বেষী। গীতোক্ত কর্মযোগী সাত্ত্বিক কর্তা-নিষ্কা, সম, শান্ত, 'দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ'। পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-ভোগ, বন্ধন; গীতোক্ত কর্ম-যোগ, মোক্ষ-সেতু। অনেকে গীতোক্ত কর্মযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাঠকের মানসপটে পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করে দেন। উহাতে গণেশ গাড়িতে বানর গআ হয়- 'বিনায়কং প্রর্কুবাণো রচয়ামাস বানরম্।' পাশ্চাত্ত্যের কর্মসূত্রের যে উচ্চতম আদর্শ, তাঁহাও গীতোক্ত আদর্শের নিম্নে। কথাটা আরো একটু স্পষ্টীকৃত করা প্রয়োজন হয়েছে। ইংরেজীতে একটি সুন্দর কথা আছে-

'I slept and dreamt that life was Beauty,
I woke and found that life was Duty'
ইহার ভাবানুবাদ এইরূপ করা হয়েছে-
'নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন,-
কি সুন্দর সুখময় মানব-জীবন।
জাগিয়া মেলিনু আঁখি, চমকিনু পুনঃ দেখি-
কঠোর কর্তব্য বৃত জীবন-যাপন (ঘোষ ২৭) ।

এস্থলে কবি বলেছেন, জীবনকে সুখময় মনে করা স্বপ্ন দেখা মাত্র, জীবন কঠোর কর্তব্যময়। এটি অতি উচ্চ কথা, কিন্তু গীতার আদর্শ উচ্চতর। অবশ্য, কর্তব্য-জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠা পাশ্চাত্ত্যের নিকট আমরা এক্ষণে শিখতে পারি, কেননা আমরা তমোগুণক্রান্ত, জড়ভাবাপন্ন, কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছি। এক্ষণে প্রথমত: সমাজে রজোগুণের উদ্রেকের প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহই উহার আদর্শস্বরূপ। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই অনেক আধুনিক কৃতবিদ্যা

ব্যক্তি গীতাকে কর্তব্যশাস্ত্র বলে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কর্তব্যপালন ও কর্মযোগ ঠিক এক কথা নই। কর্তব্যপালনে কর্তার অহংজ্ঞান থাকে, ফলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি থাকে, অনেক সময় একটা কঠোরতার অনুভূতিও থাকে এবং সর্বদাই অন্যের প্রতি বাধ্যবাধকতার ভাব থাকে। কিন্তু গীতোক্ত কর্মযোগী ও সকলের উপরে। তিনি অনহংবাদী, মুক্তসঙ্গ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার। তিনি আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত; তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য নেই, তিনি সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছেন। ভগবানের কার্য তার মধ্য দিয়ে হচ্ছিল। কর্তা ঈশ্বর, তিনি যন্ত্রমাত্র; এই হেতুই তিনি অনাসক্ত বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করতে পারেন। কর্তব্যজ্ঞানের প্ররোচনা থাকতে একেবারে নিষ্কাম হওয়া যায় না।

কথা হচ্ছে এই, গীতা লৌকিক কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ নয়, উহার কর্মোপদেশের সহিত গভীর অধ্যাত্মজ্ঞানে ও ঐকান্তিক ভগবদ্-ভক্তি মিশ্রিত। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ কর্মতত্ত্বের বিচার করে কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে; আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ, মোক্ষ, জ্ঞান- ভক্তির সহিত তার কোন সম্পর্ক নাই। পাশ্চাত্য জর্মান-পণ্ডিত নিৎসে কর্ম- মাহাত্ম্য বা শক্তি-সাধনা, যুদ্ধের কর্তব্যতা, আদর্শ মনুষত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক বিচার করেছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলেছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমেশ্বর গতাসু হয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ আদর্শ মানব-সমাজে খ্রীষ্টের স্থান নাই। গীতায়ও আদ্যোপান্ত কর্মপ্রেরণা, যুদ্ধপ্রেরণা, কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান এতৎ প্রসঙ্গে কি বলেছেন ? "মামনুস্মর যুধ্য চ'-আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর, আমাতে চিত্ত রাখ, ফলাশা ত্যাগ কর, আমাতে কর্ম অর্পণ কর, আর যুদ্ধ কর ইত্যাদি। 'গীতায় আদ্যোপান্ত ঈশ্বরবাদ। পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ 'অধিক সুখ'। গীতার উপদেশ- সুখদুঃখের অতীত হও-নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান্ হও। এটাই অধ্যাত্মতত্ত্বের শেষ কথা। বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্ম মানবীয় কর্ম নয়, ঐশ্বাররিক কর্ম, উহাতে ঐশ্বরিক প্রকৃতি লাভ করতে হয়। সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের সহিত তার তুলনা হয় না।

'That which the Gita teaches is not a human but a divine action; not the performance of social duties but the abandonment of all other standards of duty or conduct for a selfless performance of divine will working through our nature.

'' ….In other words, the Gita is not a book of practical ethics but of spiritual life." – Sree Aurobindo, Essayes on the Gita (ঘোষ ২৮) ।

৩। জ্ঞানে ব্রহ্মসদ্ভাব-সর্বভূতে ভগবদ্ভাবঃ- সমত্ববুদ্ধি- গীতার অনেক স্থলেই 'ব্রহ্মভাব', 'ব্রাহ্মভূত' ব্রাহ্মীস্থিতি', 'সাম্যবুদ্ধি' ইত্যাদি কথা আছে এবং এই ভাব লাভ করেই কর্ম করতে হবে এবং এই ভাব লাভ হলেই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে, এররূপ কথাও আছে। 'ব্রহ্ম' বলতে বুঝায় যা সর্ব-বৃহৎ, যা সব্যব্যাপী; যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া

আছেন, যাতে সমস্ত আছে, যার সত্তায় সমস্ত সত্তান্, সেই অদ্বয় নিত্যবস্তুই ব্রহ্ম। এটা পরমেশ্বরের নির্বিশেষে নির্গুণ বিভাব। এই ব্রহ্মসত্তার অনুভূতির নামই ব্রহ্মসদ্ভাব বা ব্রহ্মাজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হলে সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়, নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন হয়, জীব প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্ত হয়, ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করে, তখন আত্মাতে ও ভগবানে সর্বভূত এবং সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন হয়, তখন সাধক ভগবানের মধ্যেই বাস করেন। তখনই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে, সর্বভূতে প্রীতি জন্মে, সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি জন্মে, নিষ্কাম কর্মে অধিকার জন্মে, তখন তার নিজের কর্ম থাকে না; সর্বকর্ম ভস্মসাৎ হয়ে, বিশ্বময়ের বিশ্বকর্ম তাঁর মধ্য দিয়ে হতে থাকে। কিন্তু মায়াবাদী বেদান্তী ব্রহ্মজ্ঞানের জীব, জগৎ ঈশ্বর সকলেই লোপ পায়; কেননা এ সকল মায়ার বিজৃম্ভণ-এক অদ্বয়, নীরব নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষে তত্ত্বই থাকে,- সুতরাং উহাতে কর্ম ও ভক্তির কোন প্রঙ্গই নেই। কিন্তু গীতোক্ত ব্রহ্মভাব নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তম পরমেশ্বরেরই নির্গুণ বিভাব, উহা তাঁতেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম হতেও উত্তম, তিনি কেবল

নির্গুণ ব্রহ্ম নই, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পিতা,মাতা, ধাতা, পিতামহ, প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃদ। সুতরাং গীতোক্ত ব্রহ্মভাবে জীবকে নিষ্ক্রিয় নীরবতার মধ্যে স্থাপিত করে না, উহাতে জীবকে নিষ্কাম ভগবৎকর্মের অধিকার দেয় এবং ভগবানে পরাভক্তি প্রদান করে। এই হেতু গীতায় ও ভাগবতে জ্ঞানীকেই 'শ্রেষ্ঠভক্ত' ও 'ভাগবতোত্তম' বলা হয়েছে। এই গীতোক্ত পুরুষোত্তম- তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব না বুঝলে গীতার বহু কথা পরস্পর অসমঞ্জস ও অসঙ্গত বলে বোধ হয়।

৪। যোগ বা ধ্যানে ভগবানে চিত্তসংযোগ :- 'যোগ' শব্দ এস্থলে ধ্যানযোগ, আত্মসংস্থা- যোগ বা সমাধি-যোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বিবৃত হয়েছে। চিত্ত স্থির করবার জন্য সকল সাধনায়ই যোগসাধনের প্রয়োজন। গীতায়ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধনের উপদেশ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক এক নয়। পাতঞ্জল যোগের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে যোগ নয়, বিয়োগ,-- প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ ('পুংপ্রকৃত্যো-র্বিয়োগোহপি যোগ ইত্যাদিতো যয়া'-- ভোজবৃত্তি)। এই বিয়োগেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি-কৈবল্যলাভ। কিন্তু গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য, বিয়োগের পর আবার যোগ অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মুক্ত হয়ে ভগবানে চিত্তসংযোগ, সুতরাং এটাতে কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি নয়, এটা আত্যন্তিক সুখেরও অবস্থা। এই সুখ ভগবানে স্থিতিলাভ-জনিত। এইরূপ যোগী যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থানই কর বা সংসারী সাজিয়া ভগবানের কর্মই কর, তিনি সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করে। এই হেতু যোগোপদেশ প্রসঙ্গে, গীতায় সর্বত্রই এই কথা-মনঃ-সংযম করে চিত্ত আমাতে সমাহিত কর, মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, গীতার কর্ম, জ্ঞান,যোগ সকল মার্গেই ঈশ্বরবাদ জড়িত, সবর্ত্রই ভগবান্ -'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।(ঘোষ ২৯) ।

৫। ভক্তিতে ভগবৎ-শরণাগতি:- কর্মে নিষ্কামতা, ব্রহ্মভাব, সমত্ববুদ্ধি, সমাধিযোগ-এ সকল তত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হয়েছে। এ সকলেরই মূলকথা হয়েছে প্রকৃতিবা মায়ার হস্ত হতে মুক্ত হওয়া-- মোক্ষলাভ বা ভগবানে স্থিতি লাভ করা। এই মায়া ত্যাগের উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ধর্মোপদেষ্টাগণ দুই রকম কথা বলেন। কেউ বলেন মায়া হচ্ছে অজ্ঞান। জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান বা মায়া দূর হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। মোক্ষ বিষয়ে জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য আছে, সে সদ্গুরুর আশ্রয়ে আত্মপ্রযত্নে বা আত্মসংস্থযোগ বা আত্মানাত্ম-বিবেক বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। এটাই জ্ঞানমার্গ। গীতায়ও অনেক স্থলে এই মার্গের উল্লেখ আছে। ইহা পুরুষকার-সাপেক্ষ। পুরুষকারের প্রতিমূর্তি,জ্ঞান-গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদের সর্বত্রই এই মার্গেরই উপদেশ দিয়েছেন এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করা অজ্ঞানতার ফল, এই কথা বলেছেন।

'যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যাদ্দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোহভিবাঞ্ছ্যতে॥'

--রাম, যাবৎ বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্তই লোকে মূর্খতাবশতঃ ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভের বাঞ্ছা করে থাকে।

পক্ষান্তরে, ভক্তিমার্গ ও ভাগবতধর্মের উপদেষ্টা ভগবান ব্যাসদেব সর্বত্র ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ভক্তিদ্বারাই ভগবৎকৃপায় জ্ঞান হয়, জ্ঞানের মোক্ষ, সুতরাং ভক্তিই মোক্ষদায়িনী- 'ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী। গীতায়ও শ্রীভগবান স্পষ্টই বলেছেন-আমার মায়া সুদুস্তরা, যে আমাকে আশ্রয় করে সে-ই মায়া অতিক্রম করতে পারে এবং প্রিয় ভক্তকে শেষে এইরূপ 'সর্বগুহ্য-তম' উপদেশ দিয়েছে-তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরন লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করব। এটাই ভগবৎ-শরণাগতি- 'আমি তোমারই, তুমি আমার একমাত্র গতি, প্রভো, রক্ষা কর'- এই ভাব অবলম্বন করে একান্তভাবে আত্ম-

সমর্পণ- এটাই গীতার শেষ উপদেশ। ভক্তিমার্গেও আর একটি উচ্চতর ভাব হচ্ছে 'তুমি আমার'। যেমন-ব্রজাঙ্গনা বলেছেন-(ঘোষ ২৩)

'হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

--হে কৃষ্ণ, তুমি জোর করে হাত ছাড়াইয়া চলে গেলে, এটাতে তোমার পৌরুষ কি ? যদি আমার হৃদয় ছাড়িয়া বলপূর্বক চলে যেতে পার, তবেই বুঝি তোমার পৌরুষ।'

এ বড় জোরের কথা। এটাই প্রেমভক্তি-ব্রজের ভাব। এখানে 'রক্ষা কর' মুক্ত কর' ইত্যাদির কোন প্রসঙ্গই নাই, কেননা যিনি ভগবানকে হৃদয়ে বসিয়েছেন, 'মুক্তি তার দাসী'। এখান কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-কেবল রসাস্বাদন। এই রসের পরিপক্বাবস্থায় 'আমিই তুমি' এই ভাব উপস্থিত হয়। তখন কেবল 'আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ'-কৃষ্ণোহং প্রতি চাপরা'। এটাই ভক্তিশাস্ত্রের অধিরূঢ় ভাব, বেদন্তের সোহহং জ্ঞান, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। এস্থলে বেদান্ত ও ভাগবত এক হয়ে গেছে। এইহেতু বলা হয়েছে, ভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ।

৬। নীতিতে আত্মৌপম্যদৃষ্টি-সাম্যবুদ্ধি:- 'নীতি' শব্দে বুঝায় কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক সূত্র বা বিধি নিয়ম। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে 'ধর্ম' শব্দই এই অর্থে সাধারনতঃ ব্যবহৃত হয় এবং কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক শাস্ত্রকেই 'ধর্মশাস্ত্র' বলা হয়। ধর্মের দুই দিক্ - একটি বহির্মুখ বা ব্যবহারিক ধর্ম, অপরটি অন্তর্মুখ বা মোক্ষধর্ম। পারিবারিক, সামাজিক বা জাগতিক সম্পর্কে অপরের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহারই নাম লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম; পাশ্চাত্ত্যগণ এটাকেই 'নীতি' বলেন। আর পরমেশ্বরের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভার্থ যে সকল বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী নির্দিষ্ট আছে তারই নাম মোক্ষধর্ম; পাশ্চাত্ত্যগণ এটাকে ধর্ম বলেন। আমাদের নীতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা সকলই মোক্ষানুকূল; এই হেতু প্রাচীন শাস্ত্রে 'নীতি' ও 'ধর্মে' বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যগণের নীতি-তত্ত্বের ভিত্তি আধিভৌতিক, এটা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এইহেতু তারা নীতি-তত্ত্বকে মোক্ষতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব হতে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলেছেন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই, আমাদের শাস্ত্রের এবং গীতাতে নীতির মূলভিত্তি কী ? এটা হয়েছে সর্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞান। পূর্বে বলা হয়েছে- আমাতে ও সর্বভূতে একই আত্মা-সর্বত্রই ভগবান'- এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, এটাতেই মোক্ষ, এই জ্ঞানলাভ হলে সর্বত্র সমত্ব-বুদ্ধি জন্মে; তখনই জীব বুঝতে পারে, আমার যাতে সুখ অপরের তাতে সুখ, আমার যাতে দুঃখ অপরের তাতে দুঃখ। এটাই আত্মৌপম্য-দৃষ্টি। এরূপ বিশুদ্ধ সাম্যবুদ্ধি লাভ করলে তাকে আর পৃথক পৃথক উপদেশ দিতে হয় না- 'পরের দ্রব্য চুরি করিও না', 'অপরকে হিংসা করিও না', 'প্রতিবেশীকেও আপনার মত ভালবাসবে' ইত্যাদি। কেননা, তখন

আপন ও পর উভয়ের সমাবেশ ভগবানে, তাই গীতার উপদেশ- এই আত্মৌপম্য-দৃষ্টি অবলম্বন করে সকলের সহিত ব্যবহার করবে শ্লোক এবং তাদের বিস্তৃত। কেবল গীতাতেই নয়, উপনিষদে, মহাভারতে, মন্বাদি শাস্ত্রে এই নীতিই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে-

'ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে॥ (ঘোষ ৩১-৩২) ।

--'আপনার যাহা প্রতিকুল বা দুঃখজনক বলে বোধ কর অন্য লোকের সহিত সেরূপ ব্যবহার করবে না, এটাই সমস্ত ধর্মের সার, অন্য যাহা কিছু কামনা-প্রসূত। পাশ্চাত্ত্য নীতি-শাস্ত্রে নীতি-তত্ত্ব বিষয়ে প্রধানত দুই মত। বিবেকবাদ; এই নীতি সার্বজনীন হতে পারে না, কেনা সকলের বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি এক রূপ হয় না। অপর মত হচ্ছে, হিতবাদ বা অধিকতর লোকের অধিকতর সুখ। এই নীতির এক প্রধান দোষ এই যে, এটাতে কর্তার বুদ্ধির কোন বিচারই হয় না, কেবল কর্মের বাহ্যফল দেখে নীতির বিচার করতে হয়। কিন্তু গীতা বলেন, কর্মের বাহ্যফল অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং তাই নীতি-বিচারের কষ্টিপাথর। কান্ট্, গ্রীন, ডয়সন প্রমূখ পাশ্চাত্ত্য নীতি-তত্ত্ববিদ্গণও এ বিষয়ে গীতার মতেরই অনুবর্তন করেছেন। পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের আর একটি ত্রুটি এই যে, অধিক লোকের অধিক সুখের জন্য আমি চেষ্টা করব, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ শ্রেষ্ঠ কেন-হিতবাদী এটার কোন উত্তর দিতে পারে না; সে উত্তর দিয়েছেন আমাদের বেদান্ত ও গীতা; কারণ; 'তৎ ত্বম্ অসি' -তুমি তাহাই। সুতরাং সর্বভূতে একই বস্তু, এই জ্ঞানলাভ করে আত্মোপময় দৃষ্টিতে সর্বভূতহিতে রত হও, এটাই গীতার উপদেশ।

৭। উপাসনা-ভগবৎকর্ম, জীব-সেবা, স্বধর্ম পালন:- উপাসনাই ভক্তিমার্গের প্রাণ। গীতার উপদিষ্ট উপাসনা কি?- ভগবৎকর্ম। ভগবৎকর্ম বলতে বুঝায় ভগবানের কর্ম বা ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম। সে কর্ম কি?- 'ভগবৎস্বরূপ' যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, ভগবৎকর্ম ও তাঁর সেইরূপই হয়। সাকার উপাসক ষোড়শোপচারে প্রতিমা পূজা করেন । গ্রীষ্মে ব্যজন, শীতে পশমী বস্ত্রদ্বারা শ্রীমূর্তি আবরন করেন। তিনি মনে করেন এটাই ভগবৎকর্ম; অবশ্য, যিনি শীত-শ্রীষ্মের জন্মদাতা, যার শাসনে চন্দ্রসূর্য, বায়ুবরুণাদি অহর্নিশ স্ব-স্ব কার্যে ব্যাপৃত রয়েছে-তিনি যে শীত-গ্রীষ্মে কষ্ট পান, ইহা কল্পনামাত্র। তবে ভাবগ্রাহী জর্নাদন ভাবের কাঙ্গাল, দ্রব্যের নয়, তাই তিনি ভক্তের ভক্তিভাবটুকুই গ্রহণ করিয়া প্রীত হন। কিন্তু এ উপাসনায় একটি আশঙ্কা আছে। মূর্তিতে ভগবান আছেন, ইহা ঠিক, কিন্তু এই ধারণা অজ্ঞের নিকট হয়ে উঠে, মূর্তিই বাস্তব ভগবান অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু সর্বদা। ভগবান কেবল মূর্তিতে নন, ভগবান সর্বভূতে। সুতরাং সর্বভূতের ভজনাই ঈশ্বরের উপাসনা। জ্ঞানীর পক্ষে উহাই ভগবৎকর্ম। এই হেতু ভাগবতশাস্ত্রে মূর্তিপূজা অপেক্ষা জীবসেবার অধিক প্রশংসা। শ্রীভাগবত বলেন- যে সর্বভূতে অবস্থিত নারায়নকে উপেক্ষা করে প্রতিমাতে নারায়ণের অচনা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। তবে কি প্রতিমা পূজার প্রয়োজন নাই? না ঠিক তাও নয়। যে পর্যন্ত সর্বভূতে নারায়ণ- জ্ঞান না হয়, সে পর্যন্ত উহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহাই চরম উদ্দেশ্য নয়, উহা চরমে পৌঁছবার উপায় মাত্র।

'অচাদাবর্চত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

"সে ব্যক্তি স্বকর্মে নিরত সে যত দিন আপনার হৃদয়ে সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে জানতে না পারে ততদিন প্রতিমাদিতে ঈশ্বরকে অর্চনা করবে"(ঘোষ ৩৩,৪৩) ।

সুতরাং জীবসেবাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, নিষ্কামভাবে যথাপ্রাপ্ত স্বধর্মপালন, সর্বভূতেরই ভজনা, কেননা উহার প্রেরণা লোকসংগ্রহ, স্বার্থাভিসন্ধি নয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কর্ম, নিজের কর্ম মনে করাটাই অজ্ঞানতা। কেননা যদি সকলেই স্বকর্ম বা স্বধর্মপালনের বিরত হয়, তা হলে বিশ্বলীলা লোপ পায়; বস্তুত: প্রত্যেক জীবেরই স্বকর্ম বিশ্বময়ের বিশ্বকর্ম এবং উহাই তার উপাসনা, এটাতেই সিদ্ধি, কিন্তু এই জ্ঞান চাই যে এটা ভগবানের কর্ম, আমার কর্ম নয়।

৮। সাধনা-ত্যাগানুশীলন: উপাসনা ভক্তিমার্গের সাধনা শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানমার্গের সাধনা, প্রাণায়ামাদি যোগমার্গের সাধনা; ত্যাগ সকল মার্গেই সাধনা। ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম-কোন পথেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেননা

ত্যাগ সকল সাধনার মূল। এই হেতু গীতায় সর্বত্রই ত্যাগানুশীলনের উপদেশ, কিন্তু গীতায় ত্যাগ অর্থ কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসমার্গ নয়, গীতোক্ত ত্যাগ কামনা-ত্যাগ, কর্মফলত্যাগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় বলা হয়েছে আদ্যোপান্ত কামনা-ত্যাগের কথা। কর্মযোগে ফলত্যাগই মুল কথা, সুতরাং কর্মযোগপ্রসঙ্গে সর্বত্রই সেই উপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গেও পূজার্চনা-ধ্যানাদি অপেক্ষা কর্মফলত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তার পরেই ভগবদ্ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, তারও মূল কথা বস্তুতঃ কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সকল মার্গেই ত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা এবং গীতোক্ত পূর্ণ যোগধর্মে এ সকলেরই সমন্বয়; সুতরাং গীতার সাধনতত্ত্বের মূলসূত্র ত্যাগ। গীতার প্রকৃত মর্ম কি? এ কথার উত্তরে পরমহংসদেব বলেছেন-'গীতা' শব্দটি তিন চার বার উচ্চারন করলেই এটা পাওয়া যায় অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' বার বার বলতে বলতে বর্ণ-বিপর্যয়ে উহার বিপরীত 'ত্যাগী বা ত্যাগী' শব্দ উচ্চারিত হয়। এটাই গীতার সারমর্ম। কেমন সুন্দর সরল ভাষায় সারগর্ভ মর্মস্পর্শী উপদেশ।

সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব- সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তি। সৎ-চিৎ আনন্দ-কর্ম, জ্ঞান,প্রেম এই তিনটি জীবে অস্ফুট, অপূর্ণ, ঈশ্বকৃতি-জড়িত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধন-বলে এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হয়ে পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে জীবও ঐশ্বরিক প্রকৃতি'বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। ভাগবতশাস্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। জীবের অন্তর্নিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে, তদনুসারে সাধনের তিনটি পথের নামকরণ হয়েছে- কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। জীবের যে অস্ফুট সদ্ভাব এটার প্রকাশ তার কর্মে, সুতরাং তার কর্ম ঈশ্বরমুখী হলেই উহার বিমুদ্ধ হয়ে নিষ্কাম কর্মযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে চিদ্ভাব এটার প্রকাশ তার জ্ঞানে, ভাবনায়, এটা ঈশ্বরমখী হয়ে সমত্ব প্রাপ্ত হলেই জ্ঞানযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে আনন্দভাব এটার প্রকাশ তার কামনায়, এটা ঈশ্বরমুখী হয়ে বিশুদ্ধ হলেই প্রেমভক্তিযোগ হয়। এই তিনটি যুগপৎ অনুষ্ঠানই জীবের পূর্ণবিকাশ, সচ্চিদানন্দের সাধর্ম্যলাভ। বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "শ্রীভগবান, সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরুঢ় হয়ে ইহাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীবকে সচ্চিদানন্দে পূর্ণবিকশিত হতে হলেই এই মার্গত্রয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হয়। সেই জন্য গীতায় দেখি, কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করে শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্তত্রিবেণীসমঙ্গম রচনা করেছেন,যে পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উচ্ছল, উজ্জ্বল, সমস্রোত প্রবহমান"

উপসংহার: 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র অমৃত বাণী যখন বিশ্বের মানব জাতির সকল ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে এবং মানুষে মানুষে সমভাব, সমদর্শী, সমতা, মমত্ব-জ্ঞান কাজে কর্মে নিষ্কামতা আসবে ঠিক তখনই গীতার মহান আদর্শ এবং নৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমত্বভাব সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন,তার নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The Aryan principle for instance, has already provided us the practice of equableness as evinced সমত্বযোগ by of Bhagavad Gita. If socialist creed are to be imported in the land ….. I should advise…. first of all to adjust them to our national brand of সমত্ব-যোগ which will refine and sublimate the equality of the west." ……. (The leader) (ঘোষ ৪৫)।

তথ্যসূত্র

১। ডঃ অমূল্য বিকাশ বসাক, *বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ঢাকা: ২০০১ খ্রি:।
২। অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, *উপনিষদ অখণ্ড সংস্করণ*, কলকাতা, ১৯৯৮।
৩। শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, কলকাতা: ২০১৬।